পরিবার পরিকল্পনা
Family Planning

ইউনিট-৬

পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম সংগঠন। পরিবারের সঙ্গে আমাদের সবার যোগাযোগ খুবই নিবিড়। একমাত্র পরিবারের সঙ্গে মানুষের নিবিড়তম মিথষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে পরিবারকে সমাজকাঠামোর মৌল সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার বলতে বুঝায় এমন একটি ক্ষুদ্র সংগঠন যেখানে বিবাহ নামক চুক্তির পরিসরে এবং রক্ত সম্পর্কের সূত্র ধরে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তানসন্ততিসহ একত্রে বসবাস করে। বর্তমানে পরিবার প্রত্যয়টির পাশাপাশি 'খানা' প্রত্যয়টি দৃষ্ট হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন পরিবারের চেয়ে খানা অধিকতর সুস্পষ্ট, যেখানে একই চুলায় রান্না হয়। উল্লেখ্য যে, পরিবার এবং বিবাহ কিন্তু এক নয়। এটি মনে রাখা খুবই জরুরি যে পরিবার হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন আর বিবাহ হচ্ছে একটি চুক্তির সম্পর্ক যার ভিত্তিতে পরিবার নামক সংগঠন গড়ে উঠে।

থপরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কার্যক্রম।

জনসংখ্যা নিরোধের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা একটি কল্যাণধর্মী কর্মসূচী হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কর্মসূচীর প্রবর্তক হচ্ছেন আমেরিকার মার্গারেট স্যাঙ্গার। তাঁর অক্লান্ড় প্রচেষ্টার ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা শীর্ষক ইউনিটের বিষয়বস্তু আমরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব ঃ

- *পাঠ- ১ বিবাহ ও পরিবার।*
- *পাঠ- ২ দাম্পত্য জীবন*
- *পাঠ- ৩ পরিবারের কার্যাবলী।*
- *পাঠ- ৪ বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো।*
- *পাঠ- ৫ পরিবার পরিকল্পনা ও তার আবশ্যকতা।*

পাঠ- ১

বিবাহ ও পরিবার

Marriage and Family

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ বিবাহ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ◆ বিবাহের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ পরিবার কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ◆ পরিবারের শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিবাহ কাকে বলে

বিবাহ হচ্ছে একটি কার্য প্রণালী বা চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্কে গড়ে উঠে। মানুষ একা বাস করতে পারে না, তাই সে জীবনসঙ্গী পেতে চায়। এ কারণে একজন পুরুষ এবং একজন নারী চায় একত্রে বসবাস করতে, তারা চায় সন্তান-সন্ততির এবং স্নেহ-ভালবাসা উপভোগ করতে। এ কারণেই বিবাহের উৎপত্তি হয়। বিবাহ পরিবার ব্যবস্থাকে বৈধতা দেয়। বিবাহ বন্ধন ব্যতীত পরিবারের কথা কল্পনা করা যায় না।

আধুনিক সমাজে বিবাহ সাধারণতঃ পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত।

এডওয়ার্ড ওয়েষ্টারমার্ক 'History of Human Marriage' গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মোটামুটি স্থায়ী এমন একটি সম্পর্ক যা কেবল সন্তান জন্মদান পর্যন্তই স্থায়ী হয় না বরং এরপরও কিছুদিন অন্তত স্থায়ী থাকে।চ সমাজবিজ্ঞানী ই,আর,গ্রোভস এর মতে, "বিবাহ হচ্ছে এমন এক দুঃসাহসিক বন্ধন যার আইনগত ভিত্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে"। আধুনিক সমাজে বিবাহ সাধারণতঃ পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত। বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পর্কিত চুক্তির সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়া যায়। পাঁচটি প্রেক্ষাপটে বিবাহের প্রকারভেদ পাওয়া যায়, যথা ঃ

i) পতি বা পত্নীর সংখ্যার প্রেক্ষিতে;
ii) পাত্র-পাত্রী নির্বাচনভিত্তিক;
iii) সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে;
iv) পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে এবং
v) পাত্র-পাত্রী মনোনয়নের নিরিখে।

বিবাহের শ্রেণীবিভাগ

প্রেক্ষাপট	শ্রেণীথ
পতি বা পত্নীর সংখ্যার নিরিখে	ক) এক পত্নীক বিবাহ খ) বহু বিবাহ
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ভিত্তিক	ক) স্বগোত্র বা অন্তঃবিবাহ খ) বহির্গোত্র বা অসবর্ণ বিবাহ
সামাজিক মর্যাদা ভিত্তিক	ক) অহলোম বিবাহ খ) প্রতিলোম বিবাহ
পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ভিত্তিক	ক) সম বিবাহ খ) অসম বিবাহ
পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন প্রেক্ষিত	ক) স্বনির্বাচিত বিবাহ খ) সংযোজিত বিবাহ

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিবাহের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হলো ঃ

১. পতি বা পত্নীর সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা ঃ

ক) এক পত্নীক বিবাহ ও
খ) বহু বিবাহ

ক) **এক পত্নীক বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে।

খ) **বহু বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে পুরুষ বা স্ত্রীলোক একাধিক স্ত্রী বা পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবনযাপন করে।

সমাজবিজ্ঞানীগণ বহুবিবাহকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করেন, যথা ঃ

ক) বহুপতি বিবাহ;

খ) বহুপত্নীক বিবাহ এবং

গ) গোষ্ঠী বিবাহ।

২. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিবাহকে দুইভাগে করেন, যথা ঃ

ক) স্বগোত্র বা অন্তঃবিবাহ ঃ এ ধরনের বিবাহে পাত্র ও পাত্রী একই গোত্র হতে নির্বাচন করা হয়।

খ) বহির্গোত্র বা অসবর্ণ বিবাহ ঃ এ ধরনের বিবাহে দুটো ভিন্ন গোষ্ঠী হতে পাত্র ও পাত্রী নির্বাচন করা হয়।

পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক ও সামাজিক সমতা হয় বিবাহে দেখা যায়, তাকে সম বিবাহ কলে।

৩. সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করেন, যথা ঃ

ক) **অহলোম বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে উচ্চ বংশের পাত্রের সাথে নিম্ন বংশের পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

খ) **প্রতিলোম বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে নিম্ন বংশের পাত্রের সাথে উচ্চ বংশের পাত্রীর বিবাহ হয়।

৪. পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা ঃ

ক) **সম বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমতা পরিলক্ষিত হয়।

খ) **অসম বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে পাত্র-পাত্রীর বয়স, শিক্ষা, রুচিবোধ, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার অসমতা পরিলক্ষিত হয়।

৫. পাত্র-পাত্রী মনোনয়নের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা ঃ

ক) **স্ব-নির্বাচিত বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে পাত্র বা পাত্রী নিজে তার জীবন সাথীকে নির্বাচিত বা মনোনীত করে।

খ) **সংযোজিত বিবাহ ঃ** এ ধরনের বিবাহে অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন করে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয় ।

পরিবার কাকে বলে

মানুষ সামাজিক জীব । পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান । বিশ্বে মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজ বিদ্যমান এবং সমাজের প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপ হল পরিবার । প্রকৃতপক্ষে পরিবার ব্যবস্থা বিকশিত হবার এক পর্যায়ে সমাজের উৎপত্তি হয় । সমাজের এই সংগঠন থেকেই মানব জাতির বিকাশ হয়েছে এবং সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবারের রূপ-কাঠামো পরিবর্তিত হয় ।

রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক পরিবারের ভিত্তি।

রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক পরিবারের ভিত্তি। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন নারী যৌথভাবে বসবাস করার সংগঠনকে পরিবার বলা হয় । পরিবারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী অসবার্ণ ও নিমকফ 'A Hand Book of Sociology' গ্রন্থে বলেন- সন্তান-সন্ততির

অধিকারী বা সন্তান-সন্ততি বিহীন স্বামী-স্ত্রীর অথবা সন্তান-সন্ততির অধিকারী কোন একজন পুরুষ বা একজন মহিলার দ্বারা গঠিত মোটামুটি স্থায়ী সংস্থাকে পরিবার বলে ।চ

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের নিমিত্তে যৌন সম্পর্ক দ্বারা সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।

পরিবার হলো স্নেহ, মায়া, মমতা ও সহযোগিতার বন্ধনে গঠিত ক্ষুদ্র অথচ শাশ্বত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ

তিনটি মূল সূত্রেত্রর উপর ভিত্তি করে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যথা ঃ

র) বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারা;
রর) বৈবাহিক প্রথা এবং
iii) পারিবারিক কাঠামোর সীমানা।

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ

ভিত্তি	শ্রেণী
বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারা	ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার
বৈবাহিক প্রথা	ক) একপত্নীক পরিবার খ) বহুপত্নীক পরিবার গ) বহুপতি পরিবার
পরিবারের কাঠামো	ক) একক পরিবার খ) যৌথ পরিবার

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ এ পর্যায়ে আলোচনা করা হলো

১. বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারা অনুযায়ী পরিবারকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা ঃ ক) পিতৃতান্ত্রিক ও খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ।

ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ঃ এ ধরনের পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। পরিবারের কর্তা হলো পুরুষ। পরিবারের ভরন-পোষণ ও নিরাপত্তাসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরুষের হাতে অর্পিত থাকে। সমাজ বিজ্ঞানী হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে আদি ও অকৃত্রিম পরিবার ব্যবস্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ।

খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ঃ এ ধরনের পরিবারে নারীর অধিকার বেশী আবার বংশ পরিচয়ও নারীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে ।

২. বৈবাহিক প্রথা অনুযায়ী পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা ঃ ক) এক পত্নীক পরিবার খ) বহুপত্নী পরিবার এবং (গ) বহুপতি পরিবার।

ক) একপত্নীক পরিবার ঃ এ ধরনের পরিবার বলতে সেই ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী লোক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে। এ ধরনের পবিারই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত।

খ) বহুপত্নীক পরিবার ঃ এ ধরনের পরিবারে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করে পরিবার গঠন করে। যেমন-ভূটানের রাজপরিবারের এ প্রথা প্রচলিত আছে।

গ) **বহুপতি পরিবার ঃ** এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে বসবাস করে । যেমন ঃ ভারতের হিমাচল প্রদেশে কিন্নর উপজাতিদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে ।

৩. পরিবারের সংগঠন, কাঠামো ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়. যথাঃ

ক) একক পরিবার ও খ) যৌথ পরিবার ।

ক) একক পরিবার ঃ এ ধরনের পরিবারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা পরিবারের সদস্য অর্ন্তভুক্ত হয় । একক পরিবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । এরূপ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা পিতার প্রাধান্য স্বীকার করা হয় ।

খ) **যৌথ পরিবার ঃ** এ ধরনের পরিবারে স্বামী, স্ত্রী সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি এমনকি স্ত্রীর ভাই-বোন ও পিতা-মাতাসহ একত্রে বসবাস করে । এরূপ পরিবারে আয়-ব্যয়, উৎপাদন ইত্যাদি পরিবারের কর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় ।

সারকথা: *বিবাহ হচ্ছে একটি কার্যপ্রনালী বা চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। আধুনিক সমাজে বিবাহ সাধারণত: পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত। বিবাহবন্ধন ব্যতীত পরিবারের কথা কল্পনাও করা যায় না। মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে সমাজের প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপ হলো পরিবার। সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ব্যবস্থা পাশ্চাত্যে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়লেও প্রাচ্যে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে পরিবার গঠন অনবদ্য রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় পরিবার ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে পূর্বে বিবেচিত হতো, এখনও হচ্ছে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. কয়টি প্রেক্ষাপটে বিবাহের শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ?

ক. দুইটি;
খ. তিনটি;
গ. চারটি;
ঘ. পাঁচটি।

২. পরিবারের শ্রেণীবিভাগ কয়টি মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করে করা যায় ?

ক. তিনটি;
খ. চারটি;
গ. পাঁচচি;
ঘ. ছয়টি;

৩. ভূটানের দ্রুপকাদের মধ্যে কোন্ ধরনের পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন আছে?

ক. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার;
খ. একপত্নীক পরিবার;
গ. বহুপতি পরিবার;
ঘ. যৌথ পরিবার।

৪. কোন্ সমাজবিজ্ঞানী পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে আদি ও অকৃত্রিম পরিবার ব্যবস্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন?

ক. এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক;
খ. ই.আর. গ্রোডস;
গ. ম্যাক্স ওয়েবার;
ঘ. হেনরী মেইন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিবাহ কাকে বলে ?
২. বহুবিবাহ কি ?
৩. পরিবার কাকে বলে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিবাহ কাকে বলে ? বিবাহের শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করুন ।
২. পরিবারের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন ।

উত্তরমালা ঃ ১. ঘ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *Metta Spencer, Foundation of Modern Sociology*
২. *Gisbert, P. Fundamentals of Sociology.*

দাম্পত্য জীবন
Conjugal life

পাঠ-২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দাম্পত্য জীবন কি- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য এবং সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন কিভাবে গড়ে তোলা যায়- সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

দাম্পত্য জীবন কি ?

একজন পুরুষ ও একজন নারী যখন আইনগত স্বীকৃতি ও সামাজিকভাবে অনুমোদিত বিবাহের মাধ্যমে একসঙ্গে জীবন-যাপন করতে শুরু করে, তখনি একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখানে পুরুষ হয় স্বামী, আর নারী হয় স্ত্রী। এ দু'য়ের সম্মিলিত যৌথ জীবনকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের দৈহিক চাহিদা পূরণ, মানসিক সাহচর্য, সামাজিক এবং নৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানবসমাজে এই দাম্পত্য জীবন একটি আইনগত প্রধান প্রতিষ্ঠান যা দৈহিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, বৈধ পারিবারিক সম্পর্ককে স্থায়ীকরণ এবং ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মকে বৈধতা দান করে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঐকান্ত্রিকতা দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে যৌন চাহিদা রয়েছে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই এই চাহিদা বৈধভাবে পূরণ হতে পারে।। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ বংশধারা সংরক্ষণই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য।

দাম্পত্য জীবন বিশ্ব প্রকৃতির এক স্বভাব সম্মত বিধান, যা কার্যকর রয়েছে মানবজাতির প্রবাহমান ধারায় এবং প্রকৃতির মধ্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেকটি প্রাণিকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।' কুরআন অনুযায়ী মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে কেন্দ্র করে।

বিবাহিত হয়ে পারিবারিক জীবন-যাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বয়স্ক নারী-পুরুষের অপরিহার্য কর্তব্য। এতে যেমন শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন সম্ভব; তেমনি যৌন মিলনের অনাবিল পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। কেননা, স্ত্রী পুরুষের জন্য আর পুরুষ স্ত্রীর জন্য শান্তি ও স্থিতিস্বরূপ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ''তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা একে অপরের কাছে পরম প্রশান্ড়ি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে। আর এভাবে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া-মায়া জাগিয়ে দিয়েছেন।'' বস্তুত নারী ও পুরুষ যেন একটি বৃক্ষমূল থেকে উদগত দু'টি শাখা।

নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবাহ হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায় ও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিবাহ ছাড়া অন্য কোনভাবে অন্য কোন পথে নারী-পুরুষের মিলন বা সম্পর্ক স্থাপন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহ হচ্ছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সুন্নাত। বিবাহকে নারী-পুরুষের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার দূর্গ বলা হয়েছে। কেননা, বিবাহ নারী-পুরুষকে কুপ্রবৃত্তি থেকে দূর্গের মত বাঁচিয়ে রাখে। বিবাহ নৈতিক চরিত্র পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখে। মনের গভীর প্রশান্ড়ি ও স্থিতি লাভ হয় বিবাহের মাধ্যমে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মে বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিকভাবে জীবন-যাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানব জীবনকে পরিপূর্ণতা দান, মানব সৃষ্টির ধারা এবং মানবিক গুণাবলী-স্নেহ-মায়া মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ লালন ও বিকাশে বৈধ দাম্পত্য জীবন অপরিহার্য। নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের কারণে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনে। তাই মানব জীবনে বিবাহ প্রথার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

স্ত্রী-পুরুষের জন্য আর পুরুষ স্ত্রীর জন্য শান্তি ও স্থিতিস্বরূপ।

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বামী ও স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিপূরক। উভয় মিলে পরিপূর্ণ মানব। এ কারণেই স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী ও সহধর্মিনী। এভাবে স্বামীও স্ত্রীর জন্য জীবনসঙ্গী, রক্ষক ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মহাপবিত্র আল্-কুরআনে বলা হয়েছে 'স্ত্রীগণ তোমাদের ভূষণ স্বরূপ, তোমরাও তাদের ভূষণস্বরূপ।' এ ভূষণ যত মার্জিত ও সুন্দর হয়; দাম্পত্য জীবন ও পার্থিব জীবন ততই সুন্দর ও বাসোপযোগী হয়। এ সম্পর্ক যাতে সুন্দর ও অটুট থাকে এ জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। আর সে সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যেই রয়েছে সুখী-সংসার জীবন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেন- ''তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার।'' এসব অধিকার আদায় ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই একটি সুখী-সুন্দর সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা সম্ভব।

বিবাহের পর থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য হিসেবে স্বামীর উপর কতগুলো মৌলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাহল-

- সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রীর অন্ন বা আহারের ব্যবস্থা করা;
- বস্ত্র বা পোশাকাদির ব্যবস্থা করা;
- বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;
- চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

স্ত্রীর বিপদ-আপদ রোগে শোকে সাহায্য-সহযোগীতা করা স্বামীর কর্তব্য।

সাধারণভাবে স্ত্রীর খাদ্য ও পোশাক যোগাড় করে দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। রাসুলে করিম (স) পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেনঃ স্ত্রীদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই গুরুত্বারোপ করবে। মূলত পারিবার পরিজনের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্ত্রীর বিপদ-আপদ, রোগে-শোকে সাহায্য-সহযোগিতা করা স্বামীর কর্তব্য। অনুরূপ ভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কম নয়। স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকেও অস্বীকার করা কোন উপায় নেই। স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজ-কর্মে স্বামীর সহযোগি হবে। তার মানসিক প্রস্তুতিকরণ, ঘর-সংসার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যবস্থা করা, ধনসম্পদের রক্ষানাবেক্ষণ ও সন্তানদের লালন পালন করা এবং সকল সাংসারিক ব্যাপারে স্ত্রী হবে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাংসারিক যাবতীয় কাজে-কর্মে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অংশগ্রহণ করবেন এবং একে আপরকে সহযোগিতা করবেন। স্বামীর আনুগত্য, কল্যাণ কামনা ও তাকে ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। একজন সহনশীল স্ত্রী স্বামীর মনে প্রেম ভালোবাসা ও মানসিক শক্তি যুগিয়ে পারিবারি জীবনে আরো গতিশীল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্বামী যখন বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে তখন যদি স্ত্রী সহাস্যবদনে তাকে স্বাগতম জানায় তবে স্বামী যত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন স্ত্রীর হাসিমাখা মুখ দেখে সে প্রশান্তি লাভ করে। স্ত্রী তার কোমলতা ও প্রেমের ছোয়ায় গার্হস্থ্য জীবনকে অনাবিল প্রশান্তির আবেশে ভরে তুলে।

পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষমতা এবং দৈহিক কোমলতার স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্ম বন্টনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের জগত ও কঠিনতর কাজ। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে গড়ে তুলবে সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজ করবে। এ জন্য হয়রত মুহাম্মদ (স) বলেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার গৃহিনী'। ঘরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারে স্ত্রীই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। স্ত্রী কেবল ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকবে-এমন কথা ইসলাম বলে না। শালীনতা রক্ষা করে নিজেকে সংযত রেখে প্রয়োজনে বাইরের জগতে কাজ করতে বাধা নেই। স্বামীর পাশাপাশি বা স্বামীর অবর্তমানে সংসারের হাল ধরার জন্য স্ত্রীকে অবশ্য সক্ষম হতে হবে।

বর্তমান যুগে মহিলারাও বাইরের জগতে, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ড়। তারা পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে কাজ করছে এবং একইভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করছে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কোন দেশ ও জাতির সার্বিক অগ্রগতির ও উন্নতির জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একজন পুরুষ ও নারী যদি সংসার তথা কর্মক্ষেত্রে সমানভাবে না চলেন তাহলে সংসার তথা রাষ্ট্রের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে। সংসারে সমস্ড় কাজে নারী-পুরুষ যদি পরস্পরকে সহযোগিতা করে তবেই সংসারটি হয়ে উঠে শান্তিময় ও অনাবিল সুখের নীড়।

দেশ ও জাতির সার্বিক অগ্রগতির ও উন্নতির জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংসার জীবনে টুকিটাকি নিয়ে মন কষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ জন্য অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। একথা সত্য যে, যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়েই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে এবং একে অপরের মধ্যে সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। স্ত্রীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্ড়রিক ভাবধারার প্রতি লক্ষ রাখা স্বামীর কর্তব্য। তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা কখনও উচিত নয়। আল-াহতায়ালা স্বামীদেরকে স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার ও সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলেছেন। মহানবী (সঃ) স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমপূর্ণ আচারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় স্বামীদের উচিত ধৈর্যধারণ করে তাদের সঙ্গে নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা, সদিচ্ছা ও আন্ড়রিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা। এর ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। খুঁটিনাটি ও ছোট খাটো অনেক দোষ স্বামীদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্য একান্ড় অপরিহার্য।

স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর পবিত্র আমানত। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, স্বামীর গোপনীয়তা রক্ষা করা, স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করা, তার আত্নীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তার আদর-উপহার সাদরে গ্রহণ করা, এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্ত্রীর কর্তব্য। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, স্বামীর সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে একজন আদর্শ স্ত্রী জীবনের চরম সুখ অনুভব করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উচিত প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করা। তারা উভয়ই উভয়ের কল্যাণ কামনা করবে। স্বামী-স্ত্রী যাবতীয় কাজ যদি পারস্পরিক পরামর্শ এবং একে অপরের সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পন্ন করে তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের ও শান্তির হয়।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উচিত প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করা।

সারকথা: *একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন আইনগত স্বীকৃতি ও সামাজিকভাবে অনুমোদিত বিবাহের মাধ্যমে একসঙ্গে জীবন-যাপন করে তাকে বলা হয় দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য হচ্ছে-স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপন, ভবিষ্যৎ বংশধারা সংরক্ষণ এবং পারস্পরিকভাবে ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন। দাম্পত্য-জীবন সুখী ও সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য কিছু অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। সে সব দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুখী সংসারজীবন। যেমন-স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্ত্রীকে আপন করে নেওয়া, ঠিক তেমনি স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে-স্বামীর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান ও ভাল আচরণ।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. আল্লাহ প্রত্যেকটি প্রাণীকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন?
ক. জোড়া হিসেবে;
খ. জোড়ায় জোড়ায়;
গ. দু'জোড়া হিসেবে;
ঘ. বহু জোড়া হিসেবে।

২. বিবাহিত হয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করা উচিৎ-উক্তিটি কোন ধর্মের?
ক. ইসলাম ধর্মের;
খ. খ্রিস্টান ধর্মের;
গ. বৌদ্ধ ধর্মের;
ঘ. সকল ধর্মের।

৩. নবী করীম কার প্রতি দয়াবান সহানুভূতিশীল হবার নির্দেশ দিয়েছেন?
ক. গরীবদের প্রতি;
খ. বিধবার প্রতি;
গ. স্ত্রীর প্রতি;
ঘ. মানুষের প্রতি।

৪. কার মধ্যে মন কষাকষি হওয়া খুব স্বাভাবিক?
ক. ভাই-বোনের মধ্যে;
খ. বাপ-মায়ের মধ্যে;
গ. প্রতিবেশীর মধ্যে;
ঘ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূল প্রশ্ন

১. দাম্পত্য জীবন কাকে বলে?
২. দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব লিখুন।
৩. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য কি বর্ণনা করুন।
৪. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. দাম্পত্য জীবন কাকে বলে? সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার উপায় বর্ণনা করুন।
২. স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরঃ ১. খ, ২. ক, ৩. গ. ৪ ঘ।

সহায়ক গ্রন্থঃ

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম: পরিবার ও পারিবারিক জীবন।

পরিবারের কার্যাবলী
Functions of family

পাঠ- ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- পরিবার গঠনের কারণগুলো বলতে পারবেন ।
- পরিবারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পরিবার গঠনের কারণ

সমাজের মৌলিক এবং ক্ষুদ্রতম সংগঠন হলো পরিবার। আমাদের সবচেয়ে বেশী নিবিড় যোগাযোগ হচ্ছে পরিবারের সঙ্গে। মানুষের অকৃত্রিম ও অতি আন্তরিক সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে পরিবারে। মিথষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় পরিবারের সঙ্গে। সমাজ কাঠামোর মৌল অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে পরিবার। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার গঠিত হয়েছে মানুষের কতগুলো মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবার গঠনের নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করেন ঃ

মানুষের কতগুলো মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে।

সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকারী সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ তথা জীবনের নিরাপত্তা বোধ ইত্যাদি ।

পরিবারের কার্যাবলী

মানুষ যাতে মূল্যবান জীবনাদর্শ এবং সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে সুন্দর ও সুখী হতে পারে সেজন্য পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে । নিম্নে পরিবারের কাজগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

মানব শিশুরা খুবই অসহায়। অচেনা পরিবেশ, অজানা ব্যক্তিকে তার ভয়। তাই সম্ভাব্য বিপদ আপদ থেকে শিশুকে রক্ষা করে তার পরিবার।

জৈবিক কাজ ঃ জৈবিক কাজ প্রধানত দু'টি; যথা-(ক) স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং (খ) সন্তান জন্মদান। এ দু'টি কাজের মধ্যে প্রথমটিতে তেমন পরিবর্তন আসেনি। জৈবিক কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের বংশ বৃদ্ধি করা অর্থ্যাৎ সন্তান উৎপাদন করা। তবে আধুনিক কিছু সংখ্যক পরিবার সন্তান জন্মদানের কাজে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে কম সন্তান জন্ম লাভের আশায়। সচেতন ও শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সচেষ্ট হচ্ছে। তবুও আধুনিকভাবে সন্তান জন্মদানের জৈবিক কাজটিকে একেবারে বাদ দেয়া হয় নি। সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনে যতই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা পরিবারের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি।

সমাজের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিক-সমাজ গড়ে তুলতেও প্রয়োজনীয় সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা পরিবারের কর্তব্য। মানুষ শুধু রক্ত-মাংসে গড়া প্রাণী নয়, তার মধ্যে জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক আবেগ-অনুভূতি, সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি রয়েছে । এগুলো তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক বৈধতা পায়। আর সন্তান লাভ করে সামাজিক বৈধতা। ওয়েষ্টারমার্ক বলেছিলেন যে, যৌন ঈর্ষাপরায়ণতা অনুপরিবারের উৎপত্তি এবং স্থায়িত্বের মূল। তাই, পরিবারের গন্ডিতেই মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে। আবেগ এবং কল্পনা দ্বারা তাড়িত হয়ে পরিবারের অবলুপ্তি কামনা করলেই পরিবার লোপ পাবে একথা ধারণা করা মোটেই ঠিক নয় ।

মনস্তাত্ত্বিক কাজঃ সন্তান লালন-পালন কাজটিকে তেমন জৈবিক কাজ বলা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি মনস্তাত্ত্বিক কাজ। শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের আদর, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি যতটা জৈবিক কাজ তার চেয়ে বেশী মনস্তাত্ত্বিক । শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমতাবোধ। শিশুর পরিচর্যা, চিত্তবিনোদন, ব্যায়াম, আদর এবং সর্বোপরি তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি পরিবার করে থাকে। আধুনিক সব সামাজিক মনোবিজ্ঞানীই এ কথা স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিত্ব গঠনে শিশুর পারিবারিক অভিজ্ঞতা এক সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে। শিশু-

কিশোরেরা অতিশয় আবেগ প্রবণ হয় । জগতের নানা রহস্য সম্পর্কে তাদের অনেক প্রশ্ন। তারা ক্ষেত্র বিশেষে স্পর্শকাতর হয়।

নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঃ যে কোন প্রজাতির তুলনায় মানব শিশুরা খুবই অসহায়। সে পরিবারের বাইরে অজানা-অচেনা যে কোন ব্যক্তিকে ভয় পেতে পারে। তাছাড়া সন্ধ্যায় বা রাতের অন্ধকারে ও বিদ্যুৎ চমকালে বা পে- নের শব্দে শিশুরা ভয় পেতে পারে। তাই পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এ ধরনের সম্ভাব্য আপদ-বিপদ থেকে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তা বিধান। গ্রামের যৌথ পরিবারগুলোতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দাদা-দাদী, নিকট আত্নীয়-স্বজন এমনকি প্রতিবেশীরাও সহযোগিতা করে। শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অনুপরিবারগুলোতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করে কাজের ছেলে-মেয়ে বা আয়া প্রমুখ। শহরের অনেক পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় থাকেন । কারণ, শহরে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী। বিদ্যুতের তারে হাত দেয়া, ব্যস্ত রাস্তায় ছুটাছুটি করা ইত্যাদি দুর্ঘটনামূলক ও ঝুঁকিবহুল পরিবেশ শহরে অনেক বেশী। এসব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে সন্তান-সন্ততির রক্ষা করার জন্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তিসহ বয়স্ক সদস্যগণকে ব্যস্ত থাকতে হয় ।

অর্থনৈতিক কাজ ঃ আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠেছিল আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনে। তখনকার সমাজে উল্লেখিত অর্থে জৈবিক প্রয়োজনটার চেয়ে আর্থিক প্রয়োজনটাই ছিল বড় । কেননা, তখন নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ, পশুপালন এবং কৃষি কাজগুলো করত। কৃষি সভ্যতা শুরুর পর থেকে পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ কর্ম করতে হয় । ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন্টন ইত্যাদি কাজকর্ম পরিবারের সদস্যদের উপর বর্তায়। মধ্যযুগে কুটির শিল্পের কাজও পরিবারগুলোই করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, কৃষি সভ্যতার যুগে পরিবার হচ্ছে একটি উৎপাদনের একক।

আধুনিক শিল্প সভ্যতার যুগে বিশেষ করে নগর সভ্যতায় পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা অনেকটা খর্ব হয়ে এসেছে বলে মনে করা হয়। এটি ঠিক যে, আধুনিক নগর সভ্যতায় পরিবারগুলো তেমন উৎপদনের একক নয়। তবে অনেক সমাজবিজ্ঞানী এটাকে ভোগের একক বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের একক না হলেও আধুনিক নগর জীবনের পরিবারগুলো আয়ের একক তো বটেই। কেননা, নগর সমাজের অনেক পরিবারেই স্বামী ছাড়াও স্ত্রী এবং তার বয়স্ক সন্তান-সন্ততি ঘরের বাইরে কাজ করছে এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জন করছে। পরিবার তাই শিল্পায়িত নগর সমাজে আয় ও ভোগের একক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো অদ্যাবধি উৎপাদন, আয় এবং ভোগের একক । যেখানে নারী-পুরষ সবাই মিলে কৃষি কাজের বিভিন্ন দিকে অংশ গ্রহণ করে ।

শিক্ষামূলক কাজ ঃ পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দান করা। আদিকালে এবং মধ্যযুগে পরিবার পরিমন্ডলেই মানুষ বিদ্যার্জন করতো। পরিবার সন্তান-সন্ততির লেখা পড়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করতো এবং অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতো। আধুনিক সভ্য সমাজে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের কাজটি গ্রহণ করেছে, তবে প্রাথমিক শিক্ষাদান কাজটি আজও পরিবারই করে আসছে । আমাদের দেশে গ্রাম এবং শহর উভয়ক্ষেত্রে শিশুর শিক্ষাদানের কাজটি পরিবারই গ্রহণ করে। পরিবারই অনানুষ্ঠানিক পন্থায় সন্তানদের নীতিবোধ শিক্ষা দেয়, বিদ্যালয়ে ভর্তি করে, বাড়িতে নিয়মিত পড়ার ওপর নজর রাখে, বাবা-মা বা পরিবারের কোন সদস্য ব্যক্তি নিজে পড়ান বা গৃহ শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করেন। তবে আজকাল শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ জটিল রূপ নিয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে। আধুনিক বাংলাদেশের নগর সমাজের পরিবারগুলো শিক্ষাদানের কাজটি আরও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষাদানের কাজটি পরিবার গ্রহণ করে না। তবে পরিবারকেই পড়াশুনার ব্যয় ভার বহন করতে হয়। কেননা, আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা অধিকাংশ দেশের মতই অবৈতনিক নয় । অতএব লক্ষ্যনীয় যে, অদ্যাবধি পরিবারই আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের কাজটি পালন করে আসছে ।

ধর্মীয় শিক্ষাদানের কাজ ঃ পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাদান। বস্তুতঃ ধর্ম মানুষকে নীতিবান, সৎ ও সত্যানুসন্ধানী করে তোলে। ধর্ম ব্যক্তিগত লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চরিত্র গঠনে বিশেষ ভুমিকা পালন করে। মূলতঃ ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব অনেক। সন্তান-সন্ততির ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম পরিবার। পরিবারই বাড়িতে বা মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে থাকে।

রাজনৈতিক কাজ ঃ পরিবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিশেষ। আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পাঠ আমরা পরিবারের মধ্যে লাভ করি। পিতা-মাতার সেবা যত্নে সন্তান-সন্ততিরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সবল হয়ে ওঠে ।

পরিবারের গন্ডিতেই সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। পরিবারেই শিশুরা শেখে পরিবারের কর্তাব্যক্তিকে মান্য করে চলা, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় জীবনেও তার কাজে লাগে। পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে দেওয়া । এ কাজটি পরিবারের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, পরিবারই সুনাগরিকের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সামাজিক কাজ ঃ পরিবারের আন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা । প্রাথমিকভাবে একাজটি পরিবারের ওপরই বর্তায়। পরিবারই তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সরবরাহ করে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করতে গেলে মানুষকে প্রতিনিয়তই তার চারপাশের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন কাজ-কর্মে তাদের মত বিনিময় করতে একাধারে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার আশ্রয় নিতে হয় । এভাবেই সে সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে এবং সমাজে বসবাস করার কৌশল আয়ত্ব করে। সমাজবিরোধী এমন অনেক কাজ আছে যা হয়তো আইনবিরোধী নয়। সমাজ কর্তৃক নিন্দিত বা সমাজবিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও প্রাথমিকভাবে পরিবারই গ্রহণ করে।

চিত্ত বিনোদনমূলক ঃ সাধারণত চিত্ত বিনোদনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা নানাবিধ খেলা-ধূলা ও গল্প-গুজবের মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ করে তাদের একঘেয়েমী দূর করার চেষ্টা করে।

সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হল পরিবার। এখানেই শিশুরা শিখে দায়িত্ব, কর্তব্য, নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের প্রথম পাঠ।

বর্তমান যুগে জীবনযুদ্ধে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী পূর্বের তুলনায় খুব কমই অবসর পায়। মাত্র ২০/২৫ বছর আগে গ্রামের মানুষ যতটা অবসর পেত আজকাল আর তা পায় না। আধুনিককালে গ্রামীণ পরিবার জীবনে অবসর কাটানোর জন্য রেডিও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যুতায়িত গ্রামে টেলিভিশনও চিত্ত বিনোদনের এক অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ সমাজের মানুষের চিত্ত বিনোদনের আরেকটি সুযোগ ঘটে হাট-বাজারে গল্প-গুজব করে। আচার-অনুষ্ঠান, তসবিহ পাঠ, প্রার্থনা করা, কুরআন পাঠ ইত্যাদি মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিত্তের প্রশান্ড়ি আনয়নে সাহায্য করে।

শহরের অবকাশের সময় হচ্ছে বিকেল, রাত, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এখানে জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকী চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ইত্যাদি অবসর যাপন এবং চিত্তবিনোদনের অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ক্লাব, পার্ক, সিনেমা, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদিও শহরের অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত। এসব চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। পরিবারের ব্যবস্থাপনায় চিত্তবিনোদনের এসব উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিবারের এসব কার্যাবলী সুশৃংখল পরিবার গঠনের অন্যতম বাহন। আর পরিবারের গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজে বিন্দুমাত্র কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারকথা : *সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকারী সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক নিরাপত্তা বোধ ইত্যাদি কারণে পরিবার গঠিত হলেও পরিবার তার ক্ষুদ্র আয়তনে বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করে। পরিবার সামাজের আদিম ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, চিত্তবিনোদনমূলক নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে। কৃষি সভ্যতার যুগে পরিবার ছিল একটি উৎপাদনের একক কিন্তু আধুনিক শিল্পায়িত নগর সমাজে পরিবার হচ্ছে আয় ও ভোগের একক। পরিবারের মধ্যে উপরোক্ত নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদিত হয় বলে পরিবারই সুনাগরিকের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. পরিবার গঠনের কারণ কি ?
   ক. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা;
   খ. সন্তান লাভের বাসনা;
   গ. উত্তরাধীকারী সৃষ্টি;
   ঘ. উপরের সবগুলি।

২. পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত কয়টি ?
   ক. দুটি;
   খ. তিনটি;
   গ. চারটি;
   ঘ. পাঁচটি।

৩. সুনাগরিকের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোন্টি?
   ক. পরিবার;
   খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান;
   গ. সমাজ;
   ঘ. সম্প্রদায়।

৪. শিল্পায়িত নগর সমাজে পরিবার কিসের একক ?
   ক. ভোগের একক;
   খ. আয়ের একক;
   গ. ভোগের ও আয়ের একক;
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন

১. পরিবার গঠনের কারণগুলো কি ?
২. পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।
২. আধুনিক সমাজে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১. ঘ, ২. ক, ৩. ক, ৪. গ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *M.F. Nimkoff, Marriage and the Family.*
২. *Huxley, The Brave New World.*

বাংলাদেশে পরিবারের কাঠামো

পাঠ-৪

Family Structure in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- মজবুত পরিবারের কাঠামো কেমন তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো

বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো আলোচনা করার পূর্বে পরিবার প্রত্যয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পরিবার কাকে বলে এবং পরিবারের প্রকারভেদ আমরা পূর্বের পাঠে আলোচনা করেছি। একথা সত্য যে পিতা-মাতা ও সন্তানসহ পরিবার নামক গোষ্ঠী পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্কসূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে থাকে। বর্তমানে অবশ্য পরিবারের পাশাপাশি খানা (household) প্রত্যয়টি সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। খানা নিম্নলিখিত তিনটি উপাদানের দ্বারা তৈরী হয় ঃ

আধুনিক পরিবারকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় খানা-পরিবার বলা হয়।

১. একই চুলায় রান্না অর্থাৎ একই হাঁড়ি থেকে যারা একত্রে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে;
২. একটি সুনির্দিষ্ট বাজেট দ্বারা এ খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় যেখানে আয়-ব্যয়ে সবাই একত্রে অংশ গ্রহণ করে থাকে, এবং
৩. হাঁড়িকে সচল রাখতে প্রত্যেকে ট্যাক্স প্রদানে বাধ্য থাকে।

একথা বলা যায়, খানায় যারা বসবাস করেন তারা মূলতঃ পরিবারই গঠন করেন। তাই আধুনিক পরিবারকে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার সুবিধার্থে খানা-পরিবার বলা হয়। এবার আসা যাক বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো আলোচনায়। বাংলাদেশের পরিবারের নির্দিষ্ট কোন কাঠামো নেই যা স্থায়ী। বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোর নিুলিখিত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ঃ

১. ধর্মগত বিভিন্নতা,
২. এলাকার (শহর/গ্রাম) বিভিন্নতা;
৩. ভূমিগত (সমতল/উঁচু) বিভিন্নতা;
৪. অর্থনৈতিক শ্রেণীমর্যাদার বিভিন্নতা, ইত্যাদি ।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো আলোচনায় প্রাধান্য পায় উপরোক্ত বিভিন্নতাগুলো।

অণুপরিবার ও যৌথ পরিবার

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো যৌথ পরিবারের আওতাভুক্ত। তবে শহরাঞ্চলের পরিবারগুলোকে অণু পরিবার বলা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যগত পরিবারগুলো এখন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে অবশ্য অনেক কারণ রয়েছে, যেমন ঃ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, সম্পত্তি বন্টন পেশাগত বিভিন্নতা, ব্যাক্তিত্বের সংঘাত, সহসা আগত আধুনিকতার ছোঁয়া ইত্যাদি। তবে গ্রামাঞ্চলের মুসলিম পরিবারগুলোর তুলনায় হিন্দুপরিবারগুলো এখনও যৌথ কাঠামোর আওতাভুক্ত ।

শহরাঞ্চলেও আজকাল যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় শহরাঞ্চলের অনুপরিবারগুলো যৌথ পরিবারে রুপান্তরিত হয়ে যায় যখন গ্রামাঞ্চল থেকে জ্ঞাতিসম্পর্কীয় আত্নীয় স্বজন অণুপরিবারের সঙ্গে বসবাস আরম্ভ করে।

পিতৃপ্রধান পরিবার

বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো পিতৃপ্রধান। অনেকে অবশ্য এমন ধারণা পোষণ করেন যে পিতৃপ্রধান পরিবারে নারীর মর্যাদা দেয়া হয় না, তা ঠিক নয়। গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলো বেশীর ভাগই পিতৃপ্রধান। শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো পিতৃপ্রধান হলেও উচ্চ শিক্ষার প্রভাব এবং উদার মনোভঙ্গীর কারণে পরিবারগুলোতে এক ধরনের সমতাবোধ তৈরী হয়েছে। ফলে বাহ্যিক দিক থেকে পরিবার কাঠামো পিতৃপ্রধান মনে হলেও পরিবারের যাবতীয় সিদ্বান্তে স্বামী-স্ত্রীর মতামতকে মূল্য দেয়া হয়।

পরিবার কাঠামোয় প্রাধান্যতার বিষয়কে আলোচনায় আনলে দুটি প্রত্যয়কে সুক্ষ্ম বিবেচনায় আনতে হয় যা হলো ক্ষমতা ও মর্যাদা। বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোয় পরিবারের নেতৃত্বে পুরুষ থাকার ফলে আমরা সিদ্বান্তে উপনীত হই যে পরিবারে পুরুষটি ক্ষমতাবান এবং নারীর মর্যাদা কম। এটা মনে রাখা

প্রয়োজন, ক্ষমতাবানরা যে সবসময় মর্যাদাধীকারী হবেন-এটি ঠিক নয়। ক্ষমতা সর্বদাই মর্যাদা তৈরী করে না।

এক বিবাহভিত্তিক পরিবার

বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারই এক বিবাহভিত্তিক পরিবার। তবে গ্রামীণ ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারগুলোর কাঠামোতে একাধিক বা বহু বিবাহ ভিত্তিক ক্রমটি দেখা যায়। তবে সম্প্রতি এর পরিমাণ বেশ কমে এসেছে। শহরাঞ্চলে বহুবিবাহ-ভিত্তিক পরিবার নেই বললেই চলে। যা আছে তা সংখ্যায় অতি নগণ্য। এটা প্রায়শঃ দেখা যায় মুসলিম-হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ে স্বামী অল্প বয়সে স্ত্রী হারালে কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হলে দ্বিতীয় বিবাহ করে। মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে যা হিন্দু সমাজে এখনও অনেকটা বাঁধাগ্রস্থ।

পিতৃবাস ও নয়াবাস নীতিভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো মূলতঃ পিতৃবাস নীতি অনুসরণ করে। বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান অনুসারে পিতৃবাসভিত্তিক পরিবার হলো এরূপ যেখানে বিবাহের পর নবদম্পত্তি প্রথানুসারে স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। বাংলাদেশের পিতৃবাসভিত্তিক পরিবার কাঠামো এখনো সচল। পিতৃবাসের উল্টোনীতি অনুযায়ী মাতৃবাসভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা বাংলাদেশে অতি নগণ্য।

তবে ইদানিং ব্যাপক নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের ফলে অনেকেই শহরাঞ্চলে কিংবা শিল্প এলাকায় নয়াবাস ভিত্তিক পরিবার গঠন করে। নয়াবাসভিত্তিক জীবনে নবদম্পত্তি স্বামীর গৃহ কিংবা স্ত্রী বাবার গৃহ-কোনটিতেই বসবাস করে না। বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে নয়াবাসভিত্তিক পরিবার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও আজকাল এই কাঠামোর পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। কেননা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে মানুষের ভিটেবাড়ীতেও অনেক সময় জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। ফলে নয়াবাসভিত্তিক পরিবার শুধুই শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে নয়, গ্রামাঞ্চলেও প্রতিদিন বাড়ছে।

মজবুত পরিবার কাঠামো

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো অত্যন্ত মজবুত। একটি পরিবারের কাঠামো তখনই মজবুত হয় যখন পারিবারিক মূল্যবোধগুলো, যেমন- আবেগ, প্রেম, ভালবাসা সহানুভূতি, মমতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, আত্বঃনির্ভরতা, মানসিক বন্ধন ইত্যাদি দৃঢ় হয়। পরিবারের কাঠামো তা সে অণু হোক, যৌথ হোক, একক বিবাহভিত্তিক হোক, বহুবিবাহভিত্তিক হোক, পিতৃবাস হোক, নয়াবাস হোক সেখানে পারিবারিক মূল্যবোধগুলো যখন শক্তিশালী হয় তখনই জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনটি আরো প্রবল হয়। এই প্রবল বন্ধন অনেক সময় যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে। জ্ঞাতি সম্পর্ক আমাদের পরিবারের কাঠামোকে এতটা শক্তিশালী ও মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত স্বজনপ্রীতির প্রসার লক্ষ্য করি। তবে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিক্ষার প্রসার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ধারণা, আর্থিক ভগ্নাবস্থা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, অকারণ ভুল বুঝাবুঝি ইত্যাদি কারণে জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন অনেকটা দুর্বল হয়েছে বটে, পরিবার কাঠামো সে অনুযায়ী দুর্বল হয় নি।

দ্বি-সূত্রীয় নীতিভিত্তিক পরিবার

বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে পাশ্চাত্যের মতই দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করা হয়। দ্বি-সূত্রীয় নীতি হলো পরিবার কাঠামোতে পিতৃ এবং মাতৃ উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা। তবে আমাদের পরিবার কাঠামো বহুলাংশে পিতৃপ্রধান হওয়ার কারণে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোতে নানা-নানীর চেয়ে দাদা-দাদী, মামা-খালার চেয়ে চাচা-ফুফুর গুরুত্ব বেশী পরিলক্ষিত হয়। শহরাঞ্চলে দ্বি-সূত্রীয় নীতিভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। কেননা, শহরাঞ্চলে নয়াবাসভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা ইদানীং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে দ্বি-সূত্রীয় নীতিভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ার পিছনে অর্থনৈতিক শ্রেণী মর্যাদাকে অনেক সময় প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হয়। তবে তারপরেও বলা যায় বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে দ্বি-সূত্রীয় নীতি বেশ অনুসরণ করা হচ্ছে।

সারকথা : *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্কসূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে থাকে। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মতই দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করা হলেও পারিবারিক মূল্যবোধগুলো: যেমন- প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, সহানুভূতি, মমতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, আত্মনির্ভরতা, মানসিক বন্ধন ইত্যাদি এখনও দৃঢ়তর।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. বর্তমানে পরিবারের পাশাপাশি কোন্ প্রত্যয়টি সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে ?
   ক. নয়াবাস;
   খ. খানা;
   গ. দ্বি-সূত্রীয় নীতি;
   ঘ. হাঁড়ি;

২. বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে কোন্ সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে ?
   ক. মুসলিম সম্প্রদায়ে;
   খ হিন্দু সম্প্রদায়ে;
   গ. শহরাঞ্চলের মুসলিম হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে;
   ঘ. উপরের সবগুলিই।

৩. বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে কোন্ নীতি অনুসরণ করা হয়?
   ক. মজবুত পরিবার কাঠামো নীতি;
   খ. পিতৃপ্রধান পরিবার কাঠামো নীতি;
   গ. নয়াবাস নীতি;
   ঘ. দ্বি-সূত্রীয় নীতিভিত্তিক পরিবার।

৪. খানা কয়টি উপাদানের উপর নির্ভর করে তৈরী করা?
   ক. দুইটি;
   খ তিনটি;
   গ. চারটি;
   ঘ. পাঁচটি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন

১. খানা কাকে বলে ?
২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবারের সংজ্ঞা কি ?
৩. বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোতে কোন্ কোন্ কারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের পরিবারের বর্তমান কাঠামো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।
২. জ্ঞাতি প্রথার সঙ্গে স্বজনপ্রীতির সম্পর্কটি বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. খ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *Gisbert, P. Fundamentals of Sociology*
২. *Malinowski, Kinship in Encyclopaedia Britannca*
৩. *মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি।*

পাঠ-৫

পরিবার পরিকল্পনা ও এর আবশ্যকতা

Family Planning and its Necessity

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসুচী বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

পরিবার পরিকল্পনা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা একটি কল্যাণধর্মী কর্মসূচী হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কর্মসূচীর প্রবর্তক আমেরিকার মার্গারেট স্যাঙ্গার। তাঁর অক্লান্ড় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচী যা মূলতঃ পরিবারকেন্দ্রিক।

পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কার্যক্রম। সংকীর্ণ অর্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বলা হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি কল্যাণকর কর্মসূচী যা মূলতঃ পরিবারকেন্দ্রিক। ব্যাপক অর্থে পরিবারের আয় ও পরিবারের সদস্য সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে তোলাই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা জীবন-যাপনের এমন একটি চিন্তাধারা ও পদ্ধতি, যা কোন ব্যক্তি বা দম্পতি স্বীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে। যাতে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উন্নতি সাধিত হয় এবং তারা দেশের সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

পরিবার পরিকল্পনা বলতে সে কর্মসূচীকে বুঝায়, যা দ্বারা পরিকল্পিত, ছোট, সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সন্ড়ানের জন্মদান পরিকল্পনা অনুযায়ী হওয়াই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মূলকথা।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য

পরিবার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সন্ড়ান লাভ, লালন-পালন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তাদের সামগ্রিক কল্যাণে সহায়তাদান। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) পরিকল্পনা মাফিক সন্তান গ্রহণে সহায়তা করা;

(২) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সবল শিশু লাভে সহায়তা করা;

(৩) পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা;

(৪) জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাদান;

(৫) দেশের সম্পদের নিরিখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত রাখা;

(৬) জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্বীকৃত আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা। বাংলাদেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী হওয়ায় এ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বিরাজমান অধিক জনসংখ্যা সমস্যার প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোন হতে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরা যায়।

জনসংখ্যাবিদদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় বিষয়ে দু'টি ভিন্নমত রয়েছে-একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং অপরটি হচ্ছে পরোক্ষ উপায়ে জন্মহার সীমিত করার পদ্ধতি।

জন্মহার দ্রুত কমাতে হলে গুরুত্ব দেয়া উচিত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রতি।

প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভনিরোধ দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং গর্ভ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, সময় অপচয় করার অবকাশ নেই। বর্তমানে বিশ্বে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতি অর্থ বছর অন্তর বিশ্বের জনসংখ্যা একশত কোটি করে বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যা ছয়শত কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ উপায় ছাড়া জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

পরোক্ষ উপায়ে জন্মহার সীমিত করার পক্ষপাতী জনসংখ্যাবিদদের মতে জন্মহার দ্রুত কমাতে গেলে গুরুত্ব দেয়া উচিত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রতি। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়োজনে মানুষ জন্মহার সীমিত রাখতে সচেষ্ট হবে। পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকদের যুক্তি হচ্ছে, প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মনিরোধের আশু ফল লাভ করা গেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কারণ পরিবার সীমিত রাখার তাগিদ অনুভব না করলে, সাধারণ লোকের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ করারই কথা নয়।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এজন্য যে, বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে যথেষ্ট সময় নেয়ার সুযোগ নেই। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭ এবং এ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামী বত্রিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণই অধিক যুক্তিযুক্ত। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ ব্যতীত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় বিশেষ করে এদেশে।

তবে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অবলম্বনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে-জনগণের মধ্যে ছোট পরিবার গঠনের আকঙ্খা সৃষ্টি। ছোট পরিবার গঠন যাতে সর্বস্তরে জনগণের নিকট কাম্য হয়, সে জন্য জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ব্যতীত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। এজন্য দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত পরিবারের আকাঙ্খা সৃষ্টি না করতে পারলে, শুধু পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মাধ্যমে জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের আকাঙ্খা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞমহল মত পোষণ করেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা মোকাবেলা করার বাস্তবসম্মত উপায় হচ্ছে প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। আবার পরিকল্পনা পদ্ধতিকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অপরিহার্য হলো পরোক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। পরোক্ষ উপায় গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। ১৯৫৩ সালে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সাংগঠনিক মর্যাদা লাভ করলেও ১৯৬৫ সাল থেকে এটি সরকারি পর্যায়ে গৃহীত হয়। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করা হয় যাতে জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৯৭-৯৮-এর তথ্যানুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়।

(১) মাঠ পর্যায়ে অপর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা;

(২) প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাদির অপর্যাপ্ততা;

(৩) সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যাবলীর অপর্যাপ্ত সংযোজন;

(৪) মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণের অভাব;

(৫) কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রয়োগের অভাব প্রভৃতি।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

(১) ধর্মীয় প্রভাব ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুশাসনের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাবে এ কর্মসূচীর প্রতি নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যেমন ঃ পর্দা প্রথা, অদৃষ্টবাদিতা, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিদ্যমান। ধর্মীয় অনুশাসন পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে বাধাগ্রস্থ করছে।

(২) নিরক্ষরতা ঃ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। নিরক্ষরতার কারণে বৃহৎ জনগোষ্ঠী জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অসচেতন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীকে তারা নিছক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে মূল্যায়ন করে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এটি যে পরিবার কল্যাণধর্মী কার্যক্রম তা বুঝতে তারা অক্ষম।

(৩) নারীদের সামাজিক মর্যাদা ঃ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত এ সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের হার শতকরা মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ হওয়ার কারণে পারিবারিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণ ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু একথা সত্য যে, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) দারিদ্র্য এবং নিম্ন জীবনযাত্রার মান ঃ দারিদ্র্যের প্রভাব ও জীবনযাত্রার মান সাংঘাতিকরকম নিম্মানের হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণের প্রতি জনগণের মধ্যে অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

(৫) পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্খা ঃ পুত্র সন্তান লাভের আকঙ্খা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অন্যতম বাধা। Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)-এর গবেষণা তথ্য অনুযায়ী ৪০টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, জর্ডান, কোরিয়া, নেপাল, পাকিস্তান ও সিরিয়ায় এ প্রবণতা প্রবল এবং শীর্ষে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ শতকরা ৯৭ জন পুত্র সন্ড়ান লাভের জন্য অধিক সংখ্যক সন্তান নিতে দ্বিধা করে না। শহুরে জনপদ শতকরা ৮০ ভাগ নারী পুত্র না হওয়া পর্যন্ত সন্তান নিতে ইচ্ছুক। শতকরা দুজন মা-বাবা পরবর্তী সন্তান কন্যা হোক এটি কামনা করে না, তিন পুত্রের জননীদের শতকরা ৯৩ জন একটি কন্যার জন্য অধিক আগ্রহী। ২-৩টি পুত্র এবং একটি কন্যা উপযুক্ত সন্ড়ান সংখ্যা বলে এদেশের জনগোষ্ঠী মনে করে।

(৬) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের জটিলতা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের ভীতি ঃ বাংলাদেশের প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বিদেশী প্রযুক্তি-নির্ভর এবং আমদানিকৃত। জনগোষ্ঠী অজ্ঞতার কারণে এ সব পদ্ধতিগুলো নিয়মিত ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া স্থায়ী পদ্ধতিগুলোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও জনগণের মধ্যে ভীতি কাজ করে যা পরিবার পরিকল্পনার অন্যতম অন্ড়রায়।

(৭) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঃ বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অত্যন্ত সীমিত এবং শহরকেন্দ্রিক। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রত্যক্ষ কোন নিরাপত্তা কর্মসূচী না থাকায় বৃদ্ধ বয়সের ভরসা হিসেবে দেখা দেয় সন্তান-সন্ততি ।

(৮) মাঠ কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ঃ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মীদের বেশির ভাগই সমাজের নিম্ন শ্রেণী হতে আসায় তারা গ্রামীণ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং আগ্রহ সক্ষম হয় না।

(৯) ত্রুটিপূর্ণ উৎসাহ দান পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীসহ স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীদের নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দালালদের প্রতারণার শিকার হয়ে জন্মদানে সক্ষম এবং অবিবাহিতরা স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় এ কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

(১০) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অপ্রতুলতা ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচারণা এবং কার্যক্রমের প্রভাবে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণেরও আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর

চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশী আমদানি নির্ভর জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর সরবরাহ চাহিদার তুলনায় কম থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না।

(১১) কর্মসূচী উদ্বুদ্ধকরণে দক্ষতার অভাব ঃ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী উদ্বুদ্ধকরণের উপর নির্ভরশীল। জনগণকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এটি গ্রহণ করার জন্য যে উদ্বুদ্ধকরণ ক্ষমতার প্রয়োজন তা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে না থাকার ফলে তারা এ কর্মসূচীকে সর্বস্তরের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারছে না।

(১২) সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের অভাব ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সরকারি এবং বেসরকারী পর্যায়ে বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর সাথে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং অসংখ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত। এদের কাজের সুষ্ঠ সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে এটি বাংলাদেশের কল্যাণমুখী কর্মসূচী হিসেবে আজও গড়ে উঠতে পারে নি।

এছাড়াও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এবং সন্তান জন্মদান, সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের স্বল্প ব্যয়, শিশুশ্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, যৌতুক প্রথার প্রভাবে বাল্যবিবাহের প্রসার, স্বাস্থ্য সেবার অভাব, অধিক শিশু মুত্যুর হার ইত্যাদি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সারকথা: *পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কার্যক্রম। পরিবারের আয় এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে তোলাই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য। বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সন্তান লাভ, লালন-পালন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তাদের সামগ্রিক কল্যাণে সহায়তাদান। কিন্তু বাংলাদেশের এই লক্ষ্য বাস্ড়বায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় প্রভাব, নিরক্ষরতা, নারিদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা, দারিদ্র ও নিু জীবনযাত্রার মান, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অপ্রতুলতা, কর্মসূচী উদ্বুদ্ধকরণে দক্ষতার অভাব, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধানের অভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশের মত একটি অতিজনবহুল দরিদ্র রাষ্ট্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রবর্তক মার্গারেট স্যাঙ্গার কোন দেশের নাগরিক ?

ক. যুক্তরাজ্য;
খ যুক্তরাষ্ট্র;
গ. ফ্রান্স;
ঘ. জার্মানী।

২. কোন্ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা করা হয় ?

ক. ১৯৭২;
খ. ১৯৭৩;
গ. ১৯৭৬;
ঘ. ১৯৮০।

৩. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাংলাদেশে সাংগঠনিক মর্যাদা লাভ করে কত সালে?

ক. ১৯৫৩;
খ. ১৯৬৫;
গ. ১৯৭৬;
ঘ. ১৯৭৩।

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার কত?

ক. ৫ থেকে ১০ ভাগ;
খ. ১০ থেকে ১৫ ভাগ;
গ. ১৫ থেকে ২০ ভাগ;
ঘ. ২০ থেকে ২৫ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিবার পরিকল্পনা কাকে বলে ?
২. বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ কি ?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার আবশ্যকতা আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১. খ, ২. গ, ৩. ক, ৪. ক।